ধারাবাহিক উপন্যাস

(পর্ব ৫ ও ৬)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-৫-

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কালো মেঘের বুক চিরে এখানে সেখানে সার্চ লাইটের মত আলো ছিটকে পড়ছে। মেঘের কিনার ঘেষে ইস্পাতের ফলার মত চকচক করছে শেষ বিকেলের আলো। চুমকি ও রুমকিকে এগিয়ে দিতে নীচে নেমে আসে ইমন এবং নীতু।

ওরা রিকসা পেয়ে যায় সাথে সাথেই। বিদায় জানিয়ে রিকসায় উঠে বসে দু বোন। রিকসা চলতে শুরু করেছে। পেছন ফিরে হাত নাড়ায় ওরা ইমন আর নীতুকে।

ইমন আর নীতু দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষন।

ভাইয়া, চল। ইমনকে ডাকে নীতু।

তুই যা। আমি একটু ঘুরে আসি। কিরে, রাস্তাঘাটের অবস্থা কি? শুনেছি, মাস্তান বাবাজীদের ভয় নাকি একটু কমেছে। বোনের দিকে তাকিয়ে বলে ইমন।

হ্যাঁ, একটু ভাল। তবে সাবধানে থাকিস। রাত করিস না। তোর কাছে মোবাইল আছে?

রুমে আছে। তবে সেটা দিয়ে তো ঢাকায় ফোন করা যাবে না।

একটু দাঁড়া, আমি বাবার ফোনটা নিয়ে আসি।

নীতু উপরে যায় আর আসে। এটা ঘরে পড়েই থাকে। আপাততঃ তুই রাখ। বলে ভাইয়ের হাতে মোবাইলটা গুজে দেয় নীতু। তাড়াতাড়ি ফিরিস। দেরী করিস না।

না, না। তাড়াতাড়ি ফিরব। কাজের চাপে কদিন ঘুমাতে পারিনি। আজ একটা বাম্পার ঘুম দিতে হবে।

একটা রিকসা ডেকে উঠে বসে ইমন। হামিদ এতক্ষনে আফিস থেকে ঘরে ফেরার কথা। ওকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য ইচ্ছে করেই ফোন করল না ইমন। কিন্তু ওকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে নিজেই বোকা বনে গেল সে। হামিদ গতকাল জার্মানী গেছে অফিসের কাজে। ওর মা অনেক করে ধরলেন, রাতের খাবার খেয়ে যেতে। অনেক বলে কয়ে রেহাই পেল সে।

ইউসুফকে পাওয়া গেল ফোনে। ইমনের গলা শুনে উচ্ছসিত আমন্ত্রন, এখনি চইলা আয়।

একটা স্কুটার ডেকে ইউসুফের অফিসে পৌছাল ইমন। ইউসুফ ভীষন ব্যস্ত। সিঙ্গাপুর থেকে পার্টি আসবে।

এর মধ্যেই সময় দিল, কফি খাওয়ালো ওর অফিসে বসিয়ে।

দোস্ত, কাল কুমিল্লা যাচ্ছি, যাবি নাকি আমার সাথে। হাসতে হাসতে প্রস্তাব দেয় ইমন।

নারে, আমার মরার সময় নাই। উত্তর দেয় ইউসুফ। তার পর ইমনের দিকে তাকিয়ে চোখ সরু করে বলে, হারামজাদা, তুই কইলি তিন দিনের লাইগা আইছস। এর মধ্যে আবার কুমিল্লা যাওনের ধান্দা। কি ব্যাপার দোস্ত, লটর ফটর কিছু বাধাইছ নাকি?

না না, ওসব কিছু না। হঠাৎ ইচ্ছা হলো। ছোট বেলায় ওখানে কাটিয়েছি। ভাবলাম, একবার ঘুরে আসি।

শুনেছিস, তিরানার সাথে জামানের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় ইউসুফ।

তাই নাকি? কবে?

উত্তর দিতে পারলোনা ইউসুফ। তার আগেই ওর মহিলা সেক্রেটারী এসে খবর দিল,
স্যার, পার্টি এসে গেছে।

দোস্ত, আমার এখন উঠতে হবে। সরি। কুমিল্লা থেকে এসে দেখা করিস। তোকে আশুলিয়া নিয়ে যাবো। বহুত খবর আছে। হেভী গল্প করা যাবে। উঠে পড়ে ইউসুফ।

ইমনও উঠলো। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর।

রাত আটটা। মতিঝিল শাপলা চত্তরের সামনে দাড়িয়ে ইমন ভাবল, তিরানাকে একবার ফোন করবে। ভাবনাটাকে পাখা মেলতে দিলনা সে। কি আর হবে ওকে ফোন করে। একই অফিসে কাজ করতো ওরা। ইমনের ভাল লাগতো ওকে। তিরানাও বন্ধুর মত ব্যাবহার করতো। ওর মনকে কোন দিন ইমন বুঝতে পারেনি। অষ্ট্রেলিয়া যাবার পর, প্রথম প্রথম তিরানার কাছ থেকে ই-মেইলের উত্তর পেত সে। শেষ দিকে আর উত্তর পেতনা। ইমন ভাবতো, আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। অনেক পরে জানলো, তিরানা ভালবাসতো জামানকে. ওকেই জীবনসঙ্গী করেছে গত বছর। অনেক কষ্ট পেয়েছিল ইমন। ভাঙ্গলেও মচকায়নি সে। ভগ্ন কাঁচ খণ্ড জোড়া দিয়ে নিজের জীবনটা আবার গড়ে তুলেছে সে।

এখন তিরানা আবার একা। ইমন কি তিরানাকে আবার ডাকবে ওর কাছে?

আর কোথায় যাওয়া যায়? যাওয়ার মতো কোন যায়গা খুজে পেল না সে। অবাক কান্ড। মাত্র সাড়ে তিন বছরে ঢাকা বন্ধু শূন্য হয়ে গেল ওর কাছে। ওর কোথাও যাওয়ার যায়গা নেই। অথচ,

অষ্ট্রেলিয়া যাবার আগে রাত বারটার আগে ঘরে ফেরার কথা চিন্তা করতে পারতোনা সে। এ' ক বছরে কতখানি বদলে গেছে ঢাকা শহর। বন্ধুদের কেউ কেউ বিদেশে চলে গেছে, কেউ কেউ বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে গেছে, আবার কেউ কেউ ব্যাবসা বানিজ্য, চাকরী বাকরী নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ইমন আড্ডা দেবার জন্য কাউকে খুঁজে পেলনা।

মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে, কাল কুমিল্লা যাবে। নীতুটা গেলে ভাল হতো। কিন্তু ওর যাবার উপায় নেই। দেখি, মাকে পটানো যায় কি না। হয়তো বন্ধুদের পাওয়া যাবে না। না পেলে কি, একটা দিন সে ঘুরে বেড়াবে ওর শৈশবের স্মৃতির অলিন্দে। স্মৃতির জানালা দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করবে ওর হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে।

আপাততঃ বাসায় যাওয়া যাক।

একটা স্কুটারে বসে ড্রাইভারকে মীরপুরের বাসার ঠিকানায় যেতে বলে আবার ভাবনার পাখা মেলে দেয় ইমন। সামান্য পরিচয়ে রুমকি, চুমকি প্রান চঞ্চল দু বোনকে ভাল লেগেছে ওর, তাতে কোন ভুল নেই। এই ভাল লাগাটার কতটা শৈশবের স্মৃতি আবেগ তাড়িত, আর কতটা বাস্তব, তার উত্তর ওর জানা নেই। জানলে হয়তো ভালো হতো।

স্যার, ডাইনে না বাঁয়ে যামু। স্কুটার ড্রাইভারের প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পায় সে।

ডানে, ডানে। হলুদ দালানটার বামের গলিতে।

ঘরে ঢুকেও মাথা থেকে চিন্তাটা সরাতে পারেনা সে।

মা, কাল ভাবছি একবার কুমিল্লা ঘুরে আসব। তুমিও চল।

তোর কি মাথা খারাপ। ছেলের কথাকে পাত্তা দেন না মনোয়ারা বেগম। তোর বাবা এখনি ফোন করলেন। দাঁড়া, আমি ডায়াল করে দিচ্ছি, তুই কথা বল।

মনোয়ারা বেগম ডায়াল করে ফোনটা ইমনের দিকে এগিয়ে দেন। ওপার থেকে বাবার গলা ভেসে আসে।

ইমন বাবার সাথে কথা বলছে। মনোয়ারা বেগম মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। ব্যাক্তিত্বের কত পরিবর্তন হয়েছে ওর। আগে বাবার সাথে কথা বলতে দশবার ঢোক গিলতো। এখন কেমন অবলীলায় কথা বলে যাচ্ছে বন্ধুর মত।

বাবা, ভাবছি কাল একবার কুমিল্লা ঘুরে আসব

তুমিও নাই, নীতুও ব্যাস্ত। বন্ধুরাও সব ব্যাস্ত। ঢাকায় বসে বসে বোরড হওয়ার চেয়ে, কুমিল্লাই ঘুরে আসি এক বার। । তোমার আমজাদের কথা মনে আছে? ওর বাবা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ছিলেন। বহুদিন ওর সাথে যোগাযোগ নাই। দেখি, ওকে যদি পাই।

না, না বাবা, শুধু এক রাতের জন্য যাবো। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, সময় করে উঠতে পারিনি।

মনোয়ারা বেগমের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। উনি চট্টগ্রাম যেতে চাইলেন, ছেলেটা রাজী হলোনা। এখন কেমন অনায়াসে কুমিল্লা যাচ্ছে। যাক, নিজের মনকে বোঝান তিনি। যদি এই অছিলায় রুমকির সাথে ওর জোড়টা লেগে যায়, তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। মেয়েটা সত্যি ভাল।

নীতুর চোখ কপালে উঠে যায় ইমনের কুমিল্লা যাবার কথা শুনে। ছটে যায় সে নিজের ঘরে।

চুমকি, চুমকি, একটা সারপ্রাইজ আছে। মোবাইলে চুমকিকে ফোন করে সে।

বলে ফেল।

ভাইয়া ওর এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে কাল কুমিল্লা যাচ্ছে।

সত্যি

তাইতো বাবাকে বললো। রাখলাম। হট নিউজ থাকলে আবার ফোন করব। বলে মোবাইল রেখে ছুটে যায় ইমনের কাছে। ইমন তখনো কথা বলছে।

ঠিক আছে বাবা, আমি ওয়াপদার রেষ্ট হাউজেই উঠবো। শনিবার দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসবো। তোমার সাথে তখন দেখা হবে। ও হ্যাঁ, তুমি তো শনিবার ফিরছ বাবা; আমিতো তোমার সাথেই আসতে পারি। আসার পথে আমাকে রেষ্ট হাউজ থেকে উঠিয়ে নিও।

অত চিন্তা করোনা বাবা। আমি সাবধান থাকবো। তুমি দেরী করোনা বাবা। কুমিল্লা দেখা হবে। আচ্ছা, রাখি।

ফোন রেখে দেয় ইমন।

মা, তুমি চল। মাকে আবার বলে ইমন।

আমি গিয়ে কি করব? তুই টো টো করে ঘুরে বেড়াবি তোর বন্ধুদের সাথে। আমি গিয়ে কি করব?

-৬-

মামার বাসায় এক বিছানায় শুতে হয় রুমকি আর চুমকি। মধ্যবিত্ত মামা-মামীর পক্ষে বাপ মরা ভাগ্নীদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব। এতে কোন দুঃখ নেই রুমকি আর চুমকির। এমন করেই প্রায় ছটা বছর কেটে গেল ওদের।

রুমকি এবার এম,এ দিয়েছে অর্থনীতিতে। চুমকি মার্কেটিংএ অনার্স পড়ে নীতুর সাথে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হবার সাথে সাথে নীতুদের পরিবারের সাথে রুমকি আর চুমকির আসা যাওয়ার সুত্রপাত। ওরা জানে, নীতুর এক ভাই বিদেশে পড়ে। আজ হঠাৎ করে সে ভাই এর সাথে দেখা হয়ে যাবে, এটা ওরা কখনো ভাবেনি।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝম ঝম করে। বিদ্যুত চমকাচ্ছে একটু পর পর। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে দু বোন। শুয়ে শুয়ে আবোল তাবোল ভাবছিল রুমকি। অনেক দিন পর বাবার কথা মনে পড়লো ওর। জেলা কোর্টে মুহুরির কাজ করতেন তিনি। স্ত্রী আর দুই মেয়ে নিয়ে ছোট্ট সংসার। মাঝে মাঝে রুমকির দাদী এসে থাকতেন। রুমকির মা সেতারা বেগম কি করে বাবার স্বল্প আয়ের সংসারটাকে এমন সুন্দর করে চালিয়ে নিতেন, সে এক অবাক কান্ড।

সবে এস এস সি পাশ করে রুমকি কলেজে ভর্তি হয়েছে। এক শুক্রবারে রুমকির বাবা, দাদীকে গ্রামের বাড়ীতে পৌছে দেবার জন্য গেছেন। পরদিন সকালে ফিরে আসার কথা।

পর দিন রুমকি যথারীতি কলেজে গেছে, চুমকি স্কুলে। দুপুরে চাচাকে কলেজে দেখে ওর অবাক হবার পালা। চাচা বললেন, রুমকির মায়ের শরীর খারাপ, ওকে একটু বাসায় যেতে হবে। রুমকি ভেবেই পায়না, সকালেই মা ওকে এগিয়ে দিলেন হাসি মুখে, এর মধ্যে মায়ের আবার কি হলো। চাচার সাথে বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকবার আগে লোকজন দেখেই কেন জানি ওর ওর মন বলে উঠল, ওর বাবা আর নেই। ঘরে ঢুকে দেখল, যা ভেবেছে, তাই। বাবার শরীরটা সাদা চাদরে ঢাকা।

গ্রামের বাড়ী থেকে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনায় বাবা ঘটনাস্থলেই বাবা মারা যান। এর পর সংসার অচল হয়ে উঠল। বাবা মাথা গোজার ঠাই ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেন নি। চাচাদের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। ওনারা ঠিক করলেন, রুমকির বিয়ে দিয়ে দেবেন। তা হলে একটা পেট তো অন্ততঃ কমবে। অগত্যা রুমকি ছোট মামীকে চিঠি লিখল। উনি রুমকিদের খুব আদর করতেন। প্রতি ঈদে অনেক উপহার পাঠাতেন ওদের জন্য। চিঠির উত্তর আর এলো না। তিন দিন পর মামী নিজেই এসে হাজির। বললেন, চল। আজ থেকে তোরা দু বোন আমার মেয়ে। ছোট মামীর কোন সন্তান ছিল না।

সেই থেকেই মামার বাসায় থাকে দু বোন। মামী ছুটাছুটি করে ওদের স্কুল কলেজে ভর্তির ব্যাবস্থা করে দিলেন। কেমন করে দেখতে দেখতে ছটা বছর চলে গেল। ছুটি ছাটা ছাড়া মায়ের সাথে

ওদের আর দেখা হয় না। রুমকির এম, এ ফাইন্যাল শেষ। এবার মায়ের সাথে কিছুদিন কাটাতে পারবে। ও স্বপ্ন দেখে, যদি একটা চাকরী পেয়ে যায়, মাকে নিয়ে এসে ঢাকায় একটা বাসা নেবে। অনেক কষ্ট করেছেন মামী। ওনাকে রেহাই দেবে এবার। ওনার একটু বিশ্রাম দরকার।

ঘুম আসছিলনা চুমকির ও। ইমনের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওর। এমন মজার মানুষ ওর চোখে পড়েনি কখনো। প্লাষ্টিকের তেলাপোকা সুতোয় ঝুলিয়ে কেমন নাস্তানাবুদ করলো নীতুকে।

আপু কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ভাবলো সে।

আপু ঘুমাচ্ছিস?

হু।

ঘুমালে কথা বলছিস কি করে?

রুমকি জানে, এটা চুমকির ভুমিকা।

কি বলবি বলে ফেল।

নীতু ফোন করলো একটু আগে। ইমন ভাইয়া নাকি কাল কুমিল্লা যাচ্ছেন ওনার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

গেলে যাবে} তাতে আমাদের কি? উনি তো আর আমাদের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছে না।

ইমন ভাইয়ার চেহারাটা কেমন গো-বেচারা, গো-বেচারা। তাই না আপা?

না না, গো-বেচারা কোথায়? জার্নি করে এসেছেন বলে হয়তো টায়ার্ড ছিলেন। তাই অমন লাগছিল।

একটা কথা বলবো আপা?

কথাতো বলছিসই, আবার ভনিতা করছিস কেন?

ইমন ভাইয়াকে তোর কেমন লাগল?

কেমন লাগল মানে? এখানে লাগালাগির প্রশ্ন আসছে কেন?

নীতু তোর সাথে ইমন ভাইয়ার বিয়ে দিতে চায়। খালাম্মা, মানে নীতুর আম্মাও তাই চান। আপা, সত্যি বলতে কি, ইমন ভাইয়াকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তুই রাজী হয়ে যা আপু।

তোর ভাল লাগলে তুইই বিয়ে করে ফেল। রুমকি সিরিয়াস গলায় বলে। তুই একটা ছেলেমানুষ, উনিও একটা ছেলেমানুষ, মিলবে ভালো।

আপা তুই এমন কাঠখোট্টা হলি কি করে? রেগে যায় চুমকি। ভদ্রলোক তোর সঙ্গ পাবার জন্য কুমিল্লা যাচ্ছে, আর তুই ওনাকে পাত্তাই দিচ্ছিসনা।

তোকে কে বললো, উনি আমাদের জন্য কুমিল্লা যাচ্ছেন? কবে থেকে মাইণ্ড রিডিংও করা শিখলি? আমার সঙ্গ না ছাই। উনি যাচ্ছেন ওনার বন্ধুর সাথে দেখা করতে , শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতে। মানুষের কত পাগমামিই না থাকে!

চুমকি রেগে আর জবাব দেয়না। সে উল্টো দিকে ফিরে শুয়ে থাকে। রুমকি আর ঘাটায়না বোনকে। সে জানে, চুমকি এমনিই। ওর উচ্ছাস অনেক বেশী।

ইমনের চোরা চাহুনির দেখাটা রুমকিরও নজর এড়ায়নি। ইমন কি লাজুক? না, তা তো মনে হয় নি। তবে ওর দেখা কি আগ্রহের দেখা, না কৌতুহলের? জবাবটা ওর বড় জানতে ইচ্ছে করে। নীতুর আর খালাম্মার আগ্রহের কথা সে অনেক দিন থেকেই জানে। মানুষের জীবন এমনই। লোকটা সম্পর্কে সে কত শুনেছে, নীতুর কাছে, খালাম্মার কাছে। ওর সম্পর্কে কোন দিন এমন গভীর ভাবে ভাবেনি। আজ একটু দেখায় সব ভাবনা ওলট পালট হয়ে গেল। সে ভাবছে। ইমনের চেহারাটা মনের পটে ভেসে আসছে বার বার। যেন কত কালের দেখা।

রাত বাড়ে। ওর ঘুম আসেনা। সে এপাশ ওপাশ করে বিছানায়। একটা কবিতার কটা লাইন মাথার মধ্যে পোকার মত কিলবিল করছে। কবিতাটা কার লেখা, ওর মনে পড়ছেনা। মনের অজান্তে কখন গুন গুন করে কবিতার লাইনগুলো করে আবৃত্তি করতে শুরু করেছে, নিজেও জানে না।

(যখন) শ্রাবন দিনের সবুজ গাছের শাখায় / নদীর তীরের গাংগ শালিকের পাখায়
পড়েছিল মেঘ ভাঙ্গা সব শেষ বিকেলের আলো, / দেখেছিলেম তোমায় আমি, লেগেছিল ভালো।

এখন শ্রাবন মাস। যখন ওরা নীতুদের বাসা থেকে ফিরছিল, আকাশে মেঘের ফাঁকে সূর্য্য ডুবছিল। রিকসায় বসে পেছনে তাকিয়ে বিদায় জানাচ্ছিল ওরা ইমন আর নীতুকে। সূর্য্যের এক টুকরো কোমল আলো এসে পড়েছিল ইমনের মুখে। ইমনের সেই চেহারাটা এখনো ভাসছে রুমকির চোখে। কেমন ভাল লাগা ঘোর নিয়ে ঘরে ফিরেছিল সে।

চুমকি, খুব নরম সুরে ডাকে সে। পাশ থেকে কোন উত্তর আসে না। চুমকি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

বিছানা থেকে নীচে নামে সে আস্তে আস্তে। জানালায় এসে দাঁড়ায়। নীচে জনশুন্য রাস্তা। এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশে। হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে পানসীর মত ধীরে ধীরে, ছাই-রঙ্গা আকাশের বুক চিরে। আকাশ জুড়ে চন্দ্র-মেঘের লুকোচুরির খেলা। রুমকির বুকে শির শির করে কাঁপন লাগে। গুন গুন করে কবিতার শেষ লাইনগুলো আবৃত্তি করে সে।

সূর্য্য কখন ডুবে গেল মেঘের আড়াল থেকে; / জানেনি কেউ, দেখেনি কেউ, বলেনি কেউ ডেকে।
জগৎ জোড়া কালোর ভিড়ে, হারিয়ে তুমি গেলে। / দেখবো তোমায় অন্ধকারে, প্রানের প্রদীপ জ্বেলে।

ইমনের সাথে কি কাল দেখা হবে? কাল দেখা হলে কি বলবে সে ইমনকে? ওর মা আর বোন চাইলেই তো হবেনা। ইমনের নিজেরও তো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকতে পারে। ওর জন্যও তো কেউ অপেক্ষা করে থাকতে পারে, দেশে কিংবা বিদেশে। রুমকির কি সুযোগ হবে তা জিজ্ঞেস করার? রাত বাড়ে আর বাড়ে। রুমকির ঘুম আসেনা।

ব্যাগ গুছাচ্ছিল ইমন।

ভাইয়া, তুই ডুবেছিস। নীতুর কথায় চমকে উঠে সে।

ডুবেছি মানে?

অত সুবোধ ছেলে সাজতে হবেনা। রুমকি আপার দিকে যেভাবে মুগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিলি ... , তোকে শেষ পর্যন্ত কুমিল্লা নিয়ে ছাড়লো।

কোথায় তাকালাম? না, না, আমিতো ওদের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছিনা ...। অনেক দিন থেকেই কুমিল্লা যাবার ইচ্ছা ছিল .....।

থাক থাক, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিতে হবেনা। তুই ব্যাগ গুছা, আমি খাবার লাগাই। বলে চলে যায় নীতূ।

কত বদলে গেছে নীতু, ভাবে ইমন। মাত্র সাড়ে তিনটা বছর। এয়ারপোর্টে সবাই বিদায় দিতে এসেছে। সবে এস এস সি দিয়েছে নীতূ। মাথায় দুটো লম্বা বেণী। সবাই আছে, নীতু কই, নীতু কই? নেই নেই, কোথাও নেই। অনেক খোঁজার পর পাওয়া গেল ওকে। একটা খামের আড়ালে দাড়িয়ে কাঁদছে সবার অলক্ষ্যে। সেই নীতু কত বড় হয়ে গেছে।

চলবে .....